শিখরবালির মাটির পুতুল পশ্চিমবঙ্গের এক লোকায়ত শিল্পধারা

মাস্টার অফ ফাইন আর্টস (প্রিন্টমেকিং) কার্যক্রমের জন্য জমা দেওয়া গবেষণা পত্র

ব্যাচ

২০২৩-২৫

জমাকারী: সুকন্যা সাহু

তালিকাভুক্ত সংখ্যা: ২৩২২২২০০০৪০০৪

নিবন্ধন সংখ্যা: ২৩০০৪০০৪৬৮৭৯

ফাইন আর্টস অ্যান্ড ডিজাইন বিভাগ

সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি

নিউটাউন, কলকাতা

ভগিনী নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়

ফাইন আর্টস্ আর ডিজাইন বিভাগ

কার্যক্রম:	মাস্টার অফ ফাইন আর্টস্
ব্যাচ:	২০২৩-২০২৫
সেমিস্টার:	৪
বিষয়ের নাম:	গবেষণাপত্র
বিষয়ের কোড:	FARTP301S04
শিক্ষক/শিক্ষিকা উপদেষ্টা:	ডঃ সঞ্জয় সেনগুপ্ত
শিক্ষক/শিক্ষিকা সহ-উপদেষ্টা (যদি থাকেন)	দশরথ দাস
ছাত্র/ছাত্রীর নাম:	সুকন্যা সাহু
তালিকাভুক্তি সংখ্যা:	২৩২২২২০০০৪০০৪
নিবন্ধন সংখ্যা:	২৩০০৪০০৪৬৮৭৯
গবেষণাপত্রের নাম:	শিখরবালির মাটির পুতুল পশ্চিমবঙ্গের এক লোকায়ত শিল্পধারা।

17.04.2025

সহ-উপদেষ্টার সই আর তারিখ

16/04/2025

উপদেষ্টার সই আর তারিখ

DECLARATION BY THE STUDENT

I hereby declare that the work which is being presented in this dissertation entitled **"শিখরবালির মাটির পুতুল পশ্চিমবঙ্গের এক লোকায়ত শিল্পধারা"** in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of **Masters of Fine Arts in Painting** is an authentic record of my own work carried out during the period from **February25** to **April** under the supervision of **(Dr) Sanjay Sen Gupta** Department of **Fine Arts and Design**, **Sister Nivedita University.**

I acknowledge that I have read and understood the UGC regulations, 2018 (*Promotion of Academic integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institutions*).

I confirm that this dissertation has been checked for plagiarism using the plagiarism checking software **www.duplicheacker.com**. At the end of the dissertation, a copy of the summary report demonstrating similarities in content and its potential source (if any), generated online using plagiarism checking software is enclosed. I herewith confirm that the dissertation has been less than 10% similarity according to the plagiarism checking software's report and meets the UGC Regulations as well as plagiarism rules of Sister Nivedita University.

I further declare that no portion of the dissertation or its data will be published without the Institute's or supervisor's permission. I have not previously applied for any other degree or award using the topics and findings described in my dissertations.

Sukanya Sahoo
17/04/25

(Signature of the students with Date)

Name of the Student: Sukanya Sahoo

Registration no.: 230040046879

Department: Fine Arts and Design

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বাবা আর মাকে, যাদের কারণে আমি আজ এই পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছি এবং এই গবেষণাপত্রের কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি।

এরপর আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার কলেজের সম্মানীয় অধ্যাপকদের, সব থেকে প্রথমে যার নাম আসে তিনি হলেন ডঃ সঞ্জয় সেনগুপ্ত, বর্তমানে আমাদের বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান। যিনি আমাকে এই গবেষণাপত্রটি সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট অনুপ্রেরণা ও সাহস দিয়েছেন। এবং নানান ভাবে সাহায্য করে গেছেন।

এর পরেই যাঁর নাম করতে হয় তিনি শ্রী অনুজিৎ চ্যাটার্জী, আমাদের বিভাগের ফলিত কলা বিষয়ের অধ্যাপক। উনি আমাকে প্রযুক্তিগত দিক থেকে পুরোপুরি সাহায্য করেছেন। এর জন্য আমি ওনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ।

শ্রী রাজীব রামচন্দ্রণ আর শ্রী কৌশিক হালদার আমাদের বিভাগের ভাস্কর্যের অধ্যাপক। এঁরা দুজনেই আমাকে এই গবেষণা করতে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন।

এর সাথে সাথে আমি আমার সমস্ত অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা দের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার এই গবেষণাপত্রটি সম্পন্ন করার কাজে সাহায্য করার জন্য।

এরপর আমি আমার সব সহপাঠীদের, যারা আমাকে এই গবেষণা পত্রের কাজে সাহায্য করেছে, তাদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

এর মধ্যে যে দুজনের নাম না নিলেই নয় তাদের মধ্যে একজন হলেন তন্ময় কুমার মিস্ত্রি আর অপরজন হলেন তনু বিশ্বাস।

এর সাথে সাথে আর একজনকে আমি একান্তভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই, ইনি যদিও আমার অধ্যাপক বা সহপাঠিকা কেউই নয় তাও আমাকে একজন গুরুর মতো একান্তভাবে সাহায্য করেছেন এনার নাম হল শুভঙ্কর মন্ডল।

এর মধ্যে যদি কারো নাম উল্লেখ করতে ভুলে গিয়ে থাকি, তবে আমাকে মার্জনা করবেন। সবাইকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা।

সুকন্যা সাহু

১৮ এপ্রিল ২০২৫

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা সংখ্যা
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	
	ভূমিকা	6-7
অধ্যায় ১:	দক্ষিণবঙ্গের পুতুল – সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত	8-9
অধ্যায় ২:	পুতুলের সেকাল ও একাল	10
অধ্যায় ৩:	পুতুল তৈরির মাধ্যম ও প্রক্রিয়া	11-12
অধ্যায় ৪:	শিখরবালির পুতুল শিল্পীর অতীত ও বর্তমান	13-14
অধ্যায় ৫:	জয়নগরের মাটির পুতুলের সঙ্গে তুলনা মূলক আলোচনা	15-16
	উপসংহার	17
	চিত্রসূচী	22
	চিত্রসূত্র	23
	নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী	24

ভূমিকা

পুতুল সাধারণত বানানো হতো শিশুদের খেলার জন্য। পুতুলগুলি মাটি, কাঠ, গালা, পাতা প্রভৃতি সরঞ্জাম দিয়ে তৈরি করা হতো। এগুলি স্থানীয় বাজার ও মেলা-পার্বণে বিক্রি করা হয়ে থাকে। আমার আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো মাটির পুতুল।

শিল্প-গবেষক দেবদত্ত গুপ্ত তার লেখায় বাংলার পুতুল শিল্পীদের দর্শনটিকে চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন --

> "কথা হল পুতুল বানাতে বসে আমাদের পাঁচ ভূতের কারবার করতে হয়। আমাদের পুতুল খেলা ওই পাঁচ ভূতের সাথেই। এমন গ্রামবাংলার শিল্পী কথনে লুকিয়ে আছে এক চমৎকার অর্থ। পাঁচ ভূত বলতে বোঝায় পঞ্চভূতের পাঁচকাহন। শাস্ত্র মতে পঞ্চভুত হল ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। আর ক্ষিতি মানে হল পৃথিবী, অপ কথার মানে হল জল। ঠিক সেইরকম তেজ কথার অর্থ হল আগুন, আর মরুৎ কথার মানে হল বাতাস এবং ব্যোম বলতে বোঝায় শূন্যতা অর্থাৎ আকাশকে। এবার দেখা যাক পুতুল কারিগর এসব দিয়ে কি করে?
>
> পুতুল কারিগর ক্ষিতি মানে পৃথিবী থেকে মাটি নিয়ে আসে। তারপর অপ অর্থাৎ জল দিয়ে শিল্পী সেই মাটিকে মাখে। সেই নরম মাটিকে সে পরিণত করে মনের মত আকার দেয়। এরপর শিল্পী ভাবেন কাঁচা মাটিতে পুড়িয়ে শক্ত করা কথা। আর তখনই তাঁর দরকার হয় আগুন অর্থাৎ তেজ। এবার তো পুতুলকে ঠান্ডা করতে হবে, তাই সেই পোড়া উত্তপ্ত পুতুল সে দেয় বাতাসের কাছে। সুতরাং তাঁর লাগলো মরুৎ-কে। এবার ব্যোমকে কাজে লাগাতে হবে শিল্পীর। কিন্তু শূন্যতাকে কিভাবে পুতুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে এর উত্তরে লোকশিল্পী বের করে নেয় অবলীলায়। সে সমস্ত পুতুলগুলি বানাতে থাকে ফাঁপা করে। আর ফাঁপা মানেই হল শূন্যতা অথবা অসংখ্য ছিদ্র করা হয় পুতুলের গায়ে। আর সেই শূন্যতাই তখন আকাশ হয়ে নেমে আসে পুতুলের গায়ে। তৈরি হয় মাটির পুতুল। এমনই হল বঙ্গ পুতুলের দর্শন কথা।"[1]

বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক ও মেশিনের তৈরি পুতুলের চাহিদা অনেক বেশি হলেও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় এখনো মাটির পুতুল পাওয়া যায়। যেমন নদীয়ার নবদ্বীপের পুতুল, বর্ধমানের নতুনগ্রাম, কলকাতার কুমোরটুলি ও কালীঘাটের পুতুল, মেদিনীপুরের মাটির পুতুল, পুরুলিয়া জেলার পুতুল, মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরের মাটির পুতুল, মুর্শিদাবাদ জেলার পুতুল, বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়া সোনামুখী ও ঝাড়গ্রাম এর পুতুল, হুগলি পুতুল, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পুতুল ইত্যাদি। আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হলো শিখরবালির মাটির পুতুল -- পশ্চিমবঙ্গের এক লোকায়ত শিল্পধারা।

---

[1] মুখোপাধ্যায়, ২০২৩: ৬৬

এর অধ্যায় একে আমি আলোচনা করেছি দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুতুলের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে করেছি শিখরবালির পুতুলের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে কিভাবে একটি কাদামাটির তাল থেকে সম্পূর্ণ পুতুল সৃষ্টি হয় তার বর্ণনা। চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে পুরনো এবং বর্তমান শিল্পীদের শিল্পকৌশল নিয়ে আলোচনা। আর পঞ্চম অধ্যায়ে আছে স্থানীয় মজিলপুরের পুতুলের সাথে শিখরবালির পুতুলের একটি তুলনামূলক আলোচনা ।

অধ্যায় ১: দক্ষিণবঙ্গের পুতুল -- সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভিন্ন স্থানে এখনও মাটির পুতুল তৈরি হয়। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল -- আখড়াপুঞ্জি ও কঙ্কনবেড়ের পুতুল, পুজালি-ডোঙ্গাডিয়ার মাটির পুতুল, নিত্যানন্দপুর-এর মাটির বউ পুতুল, মজিলপুরের পুতুল, কামারডাঙ্গর পুতুল,বড়িয়ার পুতুল,সুভাষ গ্রামের পুতুল, ইত্যাদি।

এর মধ্যে আখড়াপুঞ্জি ও কঙ্কণবেড়ের পুতুল পোড়ামাটির তৈরি। তার উপরে রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়। অধিকাংশই ছাঁচে বানানো। পাশাপাশি, হাতে গড়া টেপা পুতুলও তৈরি করা হয়। পুতুলগুলোকে হালকা করার জন্য মাটিকে পাতলা রুটির মতো বেলে নিয়ে তারপর ছাঁচে ফেলা হয়। তারপর পুতুলের অবয়বের সামনের ও পেছনের দুটো খোল জোড়া দিয়ে, এগুলিকে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়। তারপর সেইগুলিকে পুড়িয়ে নিয়ে, শেষে রঙ করা হয়। এখানকার শিল্পিদের রং করার পদ্ধতি বেশ পুরনো । ভূসোকালি, তুঁতে, মেটে সিঁদুর, হরিতাল, এলামাটি, গেড়িমাটি, কাঠখড়ি আর আলতা, এইসব উপকরণ দিয়েই পুতুলের সাজসজ্জা পরিপূর্ণ হতো। যদিও আজকাল অবশ্য রাসায়নিক রঙ-এর ব্যবহার করা হয়। রঙ ভালোভাবে ধরানোর জন্য তেঁতুলবীজের আঠা বা নিমের আঠা প্রভৃতির প্রলেপ দেওয়া হয়। পুতুলগুলির নামও বেশ অদ্ভূত, যেমন -- সিলেট পুতুল, হিলিং পুতুল, মুখোশ পুতুল বা বড় পুতুল ও ঝুনঝুনি পুতুল। এছাড়াও কিছু পশু পাখি ও দেব-দেবীর পুতুলও বানিয়ে থাকেন এখানকার শিল্পীরা।[2]

পুজালি-ডোঙ্গাডিয়ার মাটির পুতুল সাধারণত কুম্ভকার সম্প্রদায়ের লোকেরা বানিয়ে থাকেন। তাই এগুলোকে অনেকে বলেন 'কুমুরে পুতুল,' যার অপভ্রংশ দাঁড়িয়েছে 'কুমিরে পুতুল।' কিন্তু এই সম্প্রদায়ের শিল্পীরা একে বলেন 'রানী পুতুল।' প্রথাগত দু-খোল ছাঁচে তৈরি হয় এই পুতুল। এর পা থাকে না। দেহের দু-পাশে লাগানো দুটি হাত। পরনে ঘাগড়া, মাথায় কোঁকড়ানো চুল। এর 'রানী' নাম সার্থক করার জন্য কোনো কোনো পুতুলের মাথায় থাকে মুকুট, গলায় থাকে ঝোলানো হার। গায়ে অভ্র মেশানো লাল রং দেওয়া হয়। এই রঙের পদ্ধতি বড় বিচিত্র। পনে পুড়িয়ে নেওয়ার পর অভ্র-মিশ্রিত তেঁতুল-বীজের কষের গোলাজলে পুতুলগুলিকে ডুবিয়ে নেওয়া হয়। পরে আবার লাল রঙের জলে ডুবিয়ে নিলে পুতুল হয়ে ওঠে উজ্জ্বল বর্ণময় প্রকৃতির।[3]

নিত্যানন্দপুর-এর মাটির বউ-পুতুলগুলো হাওড়ার রানী-পুতুলের মত দেখতে হলেও, এর গঠন অনেকটা আলাদা। কিন্তু তুলনামুলকভাবে রোগা ও লম্বাটে এই পুতুলের মুখমন্ডলের আকার বেশ বড় হয়। তবে এখানকার শিল্পীরা এই পুতুলকে 'বউ পুতুল' নামে অভিহিত করেছেন। পুতুলগুলো তৈরি হয় মাঠের এঁটেল মাটি দিয়ে, এবং একে রূপ প্রদান করা হয় ছাঁচের মাধ্যমে। এরপর শিল্পীরা দক্ষ হাতে পুতুলের গায়ে কারুকার্য অঙ্কন করেন, যা পুরোপুরি নিজের মন থেকে বানায়। রঙের জন্য অভ্রকে প্রথমে পোড়ানো হয়, তারপর একটি পাত্রে জলে ভিজিয়ে রাখা হয় । তারপর অভ্র ও জলটিতিক ভালোভাবে মেখে পুতুলগুলিকে রং করা হয়।[4]

মজিলপুরের পুতুলগুলো ছাঁচে ও হাতে তৈরি করা হয়, এবং এর মাঝের অংশ ফাঁপা থাকে। সাধারণত পুতুলের আলাদা দুটি অংশে তৈরি করে পরে সেগুলোকে জোড়া দিয়ে সম্পূর্ণ করা হয়। এখানে মূলত দুই ধরনের পুতুল তৈরি হয়। প্রথমত,কাঁচা মাটির তৈরি মূর্তি, যা মূলত পূজার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা রোদে শুকানোর পর রঙ করা হয়। দ্বিতীয়ত,

---

[2] সাঁতরা ২০১৮: ৪৩

[3] সাঁতরা ২০১৮: ৪৮

[4] আমাদের কথা, ২০২৩

অন্যান্য ধরনের পুতুল, যা শুকানোর পর পুড়িয়ে নিয়ে তারপরে রং করা হয়। এই পুতুলগুলোর গঠন এবং রং (বিশেষত চোখ) খুবই আকর্ষণীয়। শিল্পীরা চোখের আকৃতিকে 'নিমপাতা,' 'বাঁশপাতা' এবং 'পটলচেরা' বলে অভিহিত করেন। রঙের ধরনও কালীঘাটের পটচিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এটি বাবু-বিবি সংস্কৃতির প্রভাবকে প্রতিফলিত করে। এখানকার পুতুলগুলোর মধ্যে আছে আহ্লাদী পুতুল, বাবু পুতুল, বেনেবউ পুতুল এবং বিভিন্ন ধরনের পশুপাখির পুতুল। পাশাপাশি, শিল্পীরা নানা লৌকিক দেবদেবী, আটেশ্বর, বনবিবি, দক্ষিণরায়, রাধাকৃষ্ণ, কালীয়দমন, জগদ্ধাত্রী, গণেশ-জননী, কৃষ্ণ-কালী ইত্যাদি দেবদেবীর পুতুলও তৈরি করেন।[5]

কামারডাঙ্গর পুতুলগুলি ছাঁচের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এরপর সেগুলো শুকিয়ে পোড়ানো হয়, তারপর রঙ করা হয়। পুতুলগুলিতে অভ্র মিশ্রিত লাল রং করা হয়ে থাকে। পুতুলগুলি দেখতে অনেকটা রানী-পুতুলের মতো হলেও এদের গড়ন তুলনামুলকভাবে পাতলা। এখানকার শিল্পীরা পুতুলগুলিকে 'রানী পুতুল' বা 'বউ পুতুল' নামে উল্লেখ করেন।[6]

বড়িয়ার শিল্পীরা কাঁচা-মাটির ছাঁচের পুতুল তৈরি করেন, যা রঙ করে তুলির মাধ্যমে তাঁদের সৃজনশীলতা প্রকাশ করেন। এখানে নানান রঙের সুন্দর পুতুল দেখতে পাওয়া যায়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — ছাতা মাথায় পুতুল, সখি পুতুল, বাচ্চা কোলে জননী, কলসি নিয়ে মেয়ে, পুলিশ পুতুল ইত্যাদি। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখি, যেমন— বাঘ, হরিণ এবং পাখির বাসা ইত্যাদি পুতুলও তৈরী করা হয়। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং দর্শকদের দৃষ্টি কাড়ে যে পুতুল, তার নাম 'ঘাড় নাড়া বুড়ো'।[7]

সুভাষ গ্রামের শিল্পীরা দাবি করেন যে তাঁদের পূর্বপুরুষদের বাস ছিল জয়নগরের নিমপীঠ আশ্রমের কাছে, যদিও বর্তমানে তাঁরা সুভাষগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। এখানকার বেশিরভাগ পুতুল ছাঁচে তৈরি হলেও, কিছু পুতুল শিল্পীরা হাতে করে গড়েন। এরপর নিজের সৃজনশীলতা অনুযায়ী রঙ করে পুতুলগুলির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। পুতুলগুলো নানারকম বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে তৈরি, যেমন -- ভারতমাতা, নেতাজি, বিবেকানন্দ, কৃষ্ণ, লক্ষ্মী, রাধা-কৃষ্ণ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তু ও পাখির পুতুলও এখানে তৈরি হয়। এই সব পুতুলের মধ্যে বাচ্চারা সবথেকে বেশি পছন্দ করে 'কলা খাওয়া হনুমান'।[8]

এই সমস্ত জায়গাগুলোর পাশাপাশি, বারুইপুর থানার অন্তর্গত শিখরবালি বলে একটা জায়গা আছে, যেখানে আজও একটা পরিবার এক বিশেষ ধরনের পুতুল তৈরী করে থাকে। এই মাটির পুতুলই হল আমার বর্তমান গবেষণাপত্রের মূল বিষয়বস্তু। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমি এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

[5] আমাদের কথা, ২০২১

[6] আমাদের কথা, ২০২৪

[7] আমাদের কথা, ২০২৪

[8] আমাদের কথা, ২০২২

অধ্যায় ২: পুতুলের সেকাল ও একাল

শিখরবালির মাটির পুতুলগুলো আগে প্রধানত পাল-পাড়ার প্রতিটি বাড়িতে তৈরি হতো। পুতুলগুলো ছিল এদের বংশ-পরম্পরায় ঐতিহ্যবাহী পুতুল। এই পুতুলগুলোর মধ্যে গুরুত্ব পেয়েছে স্থানীয় গ্রাম্য সংস্কৃতি ও লৌকিকতা। পরিবারের পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মহিলারাও এই পুতুল বানিয়ে থাকতেন। এবং পুতুলই ছিল এখানকার পরিবারগুলোর অর্থ উপার্জনের মূল মাধ্যম। অতীতে পুতুলের বিপুল চাহিদা ছিল স্থানীয় মানুষের কাছে ও বিভিন্ন মেলা-পার্বণে। শুধু স্থানীয় এলাকায়ই নয়, শিল্পীরা এই পুতুল নিয়ে পাড়ি দিত দূর-দুরান্তের বিভিন্ন মেলা-পার্বণে। অবশ্য আগে মেলা–পার্বণেরও প্রচলন ছিল অত্যাধিক পরিমাণে। এছাড়াও শিল্পীরা আগে পুতুলগুলো ঝুড়িতে ভরে পাড়ায়-পাড়ায়ও ঘুরে বেড়াতো বিক্রির জন্য।এরা জোরে জোরে বলতেন, পুতুল নেবে গো, পুতুল! এই ধ্বনি শুনে বেরিয়ে আসত পাড়ার ছোট ছোট খুদে বাচ্চারা পুতুল কেনার জন্য। তখন অবশ্য মাটির পুতুলই শিশুদের একমাত্র খেলার মাধ্যম ছিল। এই পুতুল বানানোর জন্য মাটি সহজেই পাওয়া যেত। এবং প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার করত শিল্পীরা। এবং এরা পুতুল বানানোর জন্য ছাঁচের ব্যবহার করত যার ফলে এরা একসাথে অনেক পরিমাণে পুতুল বানাতে পারত। তাই পুতুলগুলোর উৎপাদন করতে খুবই কম খরচ হতো, এর ফলে এটি বিক্রি করে শিল্পীদের লাভ হতো। শিল্পীরা পুতুলগুলি আকৃতি অনুযায়ী এদের দাম নির্ধারণ করতেন। সবথেকে ছোট পুতুলটি মূল্য নির্ধারণ ছিল চারটে একটা টাকা, মাঝারি পুতুলটি ছিল দুটো এক টাকা, এবং তার থেকে বড় পুতুলটি ছিল দু টাকা মূল্যের।

বর্তমানে শিখরবালির ঐতিহ্যবাহী মাটির পুতুল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্তির পথে এসে দাঁড়িয়েছে। কারখানায় উৎপাদিত প্লাস্টিকের পুতুলের কারনে অন্যান্য সব পুতুলের মত এই পুতুলের চাহিদাও কমেছে। ফলে বেশিরভাগ পরিবার পুতুল বানানোর কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। এখনমাত্র দুটো পরিবার তাদের বংশ-পরম্পরায় পুতুল বানানোর কাজকে কোনরকমে ধরে রেখেছেন, যদিও এখন পরিবারের পুরুষেরা এই পুতুল বানাতে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন না। তাই বর্তমানে পুতুল তৈরির কাজ পরিবারের মহিলাদের হাত ধরে টিমটিম করে চলছে। তাছাড়াও আজকাল বিভিন্ন এলাকায় আগের মত আর মেলা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হয় না, এর ফলেও পুতুল বিক্রির পরিমাণ কমেছে বেশ কিছুটা। এই পুতুল বানানোর পুরনো শিল্পীরা বয়সের ভারে জরাজীর্ণ তাই তারা আগের মত আর ঝুড়ি সাজিয়ে পাড়ায় পাড়ায় পুতুল বিক্রি করার জন্য ঘুরে বেড়ান না। তাছাড়াও এলাকার বাইরে কোন মেলা পার্বণে অনুষ্ঠানেও তারা আর পুতুল নিয়ে বসেন না। বর্তমানে তাদের পুতুল বিক্রির স্থান হল তাদের বাড়ির কাছে জ্যৈষ্ঠ্য মাসে অনুষ্ঠিত শীতলাপুজোর মেলা। নতুন প্রজন্ম এই পুতুল বানানো শেখার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয়। তাছাড়াও তারা তাদের পুতুলের গঠন আকৃতি সবকিছুকে আগের মতই ধরে রেখেছেন। তারা বর্তমানের সাথে তাল মিলিয়ে তাদের পুতুলকে পরিবর্তন করতে আগ্রহী নয়। এর ফলেও এদের পুতুলের বিক্রির পরিমাণ বেশ কিছুটা হলেও কমেছে। এবং এদের পূর্বপুরুষদের বানানো মাটির ছাঁচগুলো অনেকগুলোই নষ্ট হয়ে গেছে আর নতুন করে এরা এই ছাঁচ বানাতে পারেনি। এর ফলে এদের পুতুলের সংখ্যা কমেছে , স্বাধীনতা কমেছে উৎপাদনও ।তাছাড়া শিল্পীরা পুতুলের দাম সামান্য বৃদ্ধি করে ছোট পুতুলের দাম ৫ টাকা, মাঝারি পুতুলের দাম ১০ টাকা, আর বড় পুতুলের দাম ১৫ টাকাই রেখেছেন। কিন্তু বর্তমানে এই পুতুলগুলো বানানোর জন্য মাটি থেকে শুরু করে রঙ্ পর্যন্ত সবকিছু বাজার থেকে বেশি মূল্য ব্যয় করে শিল্পীদের ক্রয় করতে হয়। তাই এর উৎপাদন খরচ অনেক বেশি পড়ে যায়। ফলে পুতুলগুলো বিক্রি করে যথেষ্ট পরিমাণে মুনাফা হচ্ছে না।

অধ্যায় ৩: পুতুল তৈরির মাধ্যম ও প্রক্রিয়া

শিখরবালির মাটির পুতুল তৈরি হয় এখানকার বংশপরম্পরা মেনে পুরনো পদ্ধতিতে। আগে যদিও এই কাজে স্থানীয় এঁটেল মাটি ব্যবহার করা হতো, কিন্তু বর্তমানে মাটি কিনে পুতুল তৈরি করা হয়।

মাটিটাকে কিনে নিয়ে আসার পর অল্প পরিমাণে জল দিয়ে ভিজিয়ে কিছুদিন ভালো করে প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। তারপর এটিকে ভালোভাবে মাখাতে হয় এবং মাখার সময় এর মধ্যে থাকা ছোট-বড় পাথরের টুকরোগুলোকে বের করে দেওয়া হয় যাতে পতুল তৈরির মাটিটি একবারে মসৃণ হয়। মাটিটি যখন পুতুল তৈরির জন্য উপযুক্ত অবস্থায় আসে তখন এগুলিকে শিল্পীরা তাদের কাছে থাকা বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ছাঁচে দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে।

প্রথমে ছাঁচগুলোকে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হয়। তারপর এর ভেতরের অংশে ভালোভাবে চক-পাউডার লাগানো হয়। যাতে মাটিটি দেওয়ার পর ছাঁচের গায়ে না লেগে যায় এবং পুতুলটি অক্ষত অবস্থায় ছাঁচ থেকে বেরিয়ে আসে। ছাঁচের দুটি অংশে আলাদা করে শিল্পীরা নিজেদের হাত দিয়ে চেপে চেপে এর মধ্যে মাটি ভরেন। কিন্তু ছাঁচ গুলোতে পুরোপুরি মাটি দিয়ে ভরাট করেন না যাতে এই দুটিকে পরে জোড়ার সময় এই দুটির মাঝখানের অংশ ফাঁপা থাকে। তারপর মাটিটি পুরোপুরি শুকানোর আগে ছাঁচের দুটি অংশ ভালোভাবে জোড়া হয়। তারপর ছাঁচ থেকে বের করে পুতুলগুলোকে রোদে শুকাতে দেওয়া হয়। এগুলো ভালোভাবে শুকানোর জন্য প্রায় পাঁচ থেকে ছয় দিন সময় লেগে যায়, তারপর প্রস্তুতি নেওয়া হয় পোড়ানোর জন্য। পোড়ানোর জন্য এগুলিকে পোনে (পোড়ানোর চুল্লি) দেওয়া হয়। দেওয়ার পর প্রথম এক ঘন্টা এগুলিকে খুব অল্প তাপমাত্রায় গরম করা হয় তারপর ধীরে ধীরে এর তাপমাত্রা বাড়ানো হয়। তারপর দু'ঘণ্টা উচ্চ তাপমাত্রায় পোড়ানো হয়। এরপর এগুলোকে ঠান্ডা হওয়ার জন্য রেখে দেওয়া হয় একদিনের জন্য। পরের দিন এগুলোকে বের করে ভালোভাবে পরিষ্কার করা হয়। তারপর এগুলোকে রং করার পালা।

পোড়ানোর পর পুতুলগুলোতে খড়িমাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। খড়িমাটিকে জলের সাথে ভিজিয়ে রাখা হয় একদিনের জন্য। তারপর তাকে জলের সাথে মিশিয়ে একটি গাঢ় মিশ্রণ তৈরী করা হয়, এরপর এটি ব্যবহারের যোগ্য হয়ে ওঠে। পোড়ানো পুতুলগুলির গায়ে খড়িমাটির প্রলেপ দিয়ে এগুলিকে শোকানোর জন্য এক দুদিন রেখে দেওয়া হয়। শুকানোর পর শিল্পীরা তাদের নিজেদের মনমতো এগুলিকে বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে তোলেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে একটা পুতুল তৈরীরর ক্ষেত্রে ঐতিহ্যকে অনুসরণ করলেও, রঙ করার ক্ষেত্রে শিল্পীরা পরম্পরা মেনে চলেন না। বাংলা তথা ভারতবর্ষের লোকায়ত শিল্পধারার এ এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

শিখরবালির পুতুলের রংটিও শিল্পীরা একটি বিশেষ পদ্ধতিতে বানিয়ে থাকেন। রং হিসাবে ওনারা বাজার থেকে কিনে আনা গুঁড়ো রং ব্যবহার করেন এবং সেই রঙের সাথে তেঁতুল বীজের আঠা মিশিয়ে থাকেন। এই আঠাটিও ওনারা বাজার থেকে গুঁড়ো কিনে নিয়ে আসেন। তারপর দুটোকে পরিমাণ মতো দিয়ে ভালোভাবে

মিশিয়ে নেওয়ার পর এটিকে পুতুলের গায়ে ব্যবহার করেন তুলির ছোঁয়ায়। এই রঙের উপর থেকে সোনালী রঙের বর্ডার দেন এবং মুখমন্ডলের ওপর কালো রঙ দিয়ে চোখ এবং মুখের আকার ফুটিয়ে তোলেন। শুকিয়ে গেলে একটা বড় পাত্রে আগে থেকে ভিজিয়ে রাখা সাবু ও জলের মিশ্রণের মধ্যে পুতুলগুলোকে ভালোভাবে ডুবিয়ে নেওয়া হয়। এরপর এগুলোকে শুকনো করার জন্য রেখে দেওয়া হয় এক থেকে দুই দিনের জন্য। অবশেষে পুতুলগুলোর গায়ের রং উজ্জ্বল করার জন্য শিল্পীরা ব্যবহার করেন বার্নিশ। এইভাবেই শিল্পীর হাতে এক একটি পুতুল গড়ে ওঠে।

অধ্যায় ৪: শিখরবালির পুতুল শিল্পীর অতীত ও বর্তমান

বারুইপুর থানার অন্তর্গত শিখরবালির মধ্যে একটি ছোট্ট পাড়া হলো পালপাড়া। এক সময় এই পালপাড়ার প্রতিটি ঘরে প্রতিটি মানুষ এই মাটির পুতুল তৈরি করত। অতীতে এই পাড়ার মাটির পুতুলই এখানকার সামাজিক জীবনযাপনকে উপস্থাপনা করতো এবং পুতুলগুলি তখন শিল্পীদের একমাত্র অর্থ ও সম্মানের মূল উৎস ছিল। এবং শিল্পীদের কাছে মূল পেশাই ছিল পুতুল নির্মাণ করা। পুতুল বিক্রি করে তাদের যা অর্থ উপার্জন হতো তার এই দিয়েই তাদের জীবন যাপন অতিবাহিত হয়ে যেত। আগে পরিবারের ছেলে মেয়ে উভয়ই সমানভাবে এই কাজ করে থাকতো। অতীতে অনেক শিল্পীরাই এই পেশার সাথে যুক্ত ছিল, যদিও তাদের নাম যথাযথভাবে কখনো কোথাও লিপিবদ্ধ করা হয় নি। কিছু শিল্পী আছে যাদের নাম আমরা পেয়েছি তাদের পারিবারিক সূত্রে। তার মধ্যে সবথেকে প্রবীণ হল সীতানাথ পাল এবং উনার স্ত্রী।

চিত্র ১: শিখরবালির শীতলা পুজোর মেলাতে, শিখরবালির পুতুলের প্রবীণ বিক্রিতা পুষ্পরাণী পাল

তারপর কালের নিয়মে পুতুলের চাহিদা কমতে থাকে বাজারের শস্তা টেঁকসই বিকল্প মাধ্যমে তৈরী তুলণামূলকভাবে আকর্ষণীয় পুতুলের কারণে। এই জন্য এখানকার সমস্ত পরিবারে তাদের পুতুল বানানোর কাজ ছেড়ে দিয়ে অর্থ উপার্জনের জন্য বিভিন্ন পেশা যোগদান করেন। অবশেষে থেকে যায় এখানকার দুটি পরিবার, যারা কালের নিয়মকে অগ্রাহ্য করে তাদের বংশ-পরম্পরার ঐতিহ্যকে কোনরকমে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন প্রয়াত কেনারাম পাল ও উনার স্ত্রী পুষ্পরাণী পাল। পাশাপাশি ছিলেন প্রয়াত ভৈরব পাল ও উনার স্ত্রী ভারতী পাল। যদিও এই সময় পরিবারের পুরুষেরা পুতুল বানানোর সাথে সাথে জীবিকা নির্বাহ ও অর্থ উপার্জনের জন্য অন্য কাজও করে থাকতেন। ইনাদের মধ্যে পুষ্পরাণী পাল এবং ভারতী পাল বর্তমানে জীবিত আছেন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাজারে পাওয়া উপকরণের দাম বাড়তে থাকায় এবং এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বহুবছর ধরে চলে আসা মেলা-পার্বণগুলো ধীরে ধীরে বন্ধ হওয়ার কারণে পুতুল বিক্রির পরিমাণ ক্রমাগত কমে আসে। তাই বর্তমানে পুষ্পরাণী পালের বাড়িতে উনার পুত্র ও পুত্রবধূরা বা বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা কেউ আর এই পুতুল বানানোর কাজ করেন না। এমন কি বতর্মান প্রজন্ম এই কাজ শেখার জন্যেও বিন্দুমাত্র উৎসাহী নয়। এর ফলে এই পরিবারও সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

চিত্র ২: শিখরবালির শীতলা পুজোর মেলাতে, শিখরবালির পুতুলের বতর্মান বিক্রিতা পূর্ণিমা পাল

এরপর আছেন ভারতী পালের পরিবার। এই পরিবারে এনার ছেলে পুতুল বানানোর কাজ করেন না, বর্তমানে তিনি অর্থ উপার্জনের জন্য জামাকাপড়ের ব্যবসা করে থাকেন। কিন্তু উনার পুত্রবধূ পূর্ণিমা পাল এখনো পুতুল বানানোর কাজটি চালিয়ে যাচ্ছেন। ইনি এখানকার পুরো পালপাড়ার ঐতিহ্যবাহী বংশ পরম্পরা ছাঁচের মাটির পুতুলের শেষ অবলম্বন হিসাবে দাঁড়িয়ে আছেন। কারণ এই পরিবারের নতুন প্রজন্ম এই পুতুল বানানো শেখার জন্য বিন্দুমাত্র উৎসাহিত নয়। ইনার পরে হয়তো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্য থেকে বাংলার আরও একটি ঐতিহ্যবাহী পুতুল হারিয়ে যাবে। হারিয়ে যাবে লোকশিল্পের এই শিল্পীরাও।

অধ্যায় ৫: জয়নগরের মাটির পুতুলের সঙ্গে তুলনা মূলক আলোচনা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার শিখরবালির পাশাপাশি ঐ একই জেলার জয়নগরের মজিলপুরেও আছে মাটির পুতুল তৈরীর আরেকটি পারম্পরিক ঐতিহ্য। এই দুই জায়গা কাছাকাছি অঞ্চলের হলেও তাদের পুতুলগুলোর গঠনবৈচিত্র্য, রঙের ব্যবহার সবকিছুই অনেক বিপরীত ধর্মী একে অপরের থেকে।

মজিলপুরের এই পুতুল প্রথমে শুরু হয়েছিল টেপা পুতুল দিয়ে। পরবর্তীকালে এরা ছাঁচ বানিয়ে বংশপরম্পরায় এই পুতুল বানিয়ে থাকেন। এদের কথা থেকে জানা যায় যে এরা প্রায় আড়াইশো বছর ধরে এই পুতুল বানিয়ে চলেছেন এখানকার শিল্পীরা। বর্তমানে এদের অষ্টম প্রজন্ম শম্ভু দাস এই পুতুল বানিয়ে থাকেন। এনারা প্রায় একশকুড়ি রকমের পুতুল বানিয়ে থাকেন। কিন্তু এদের সমস্ত ছাঁচ বংশ পরম্পরায় বানানো নয়, কিছু কিছু ছাঁচ শিল্পী বিশেষ তার সময়কালে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নিজের হাতে বানিয়েছেন। ইনাদের এই পুতুলের মধ্যে সবথেকে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে দেব-দেবীর মূর্তি, যেমন -- শীতলা, লক্ষীনারায়ণ, দুর্গা, শিব-সতী, কালী, নারায়ণ, মাতাল শিব, নন্দী-ভৃঙ্গী, কালীয়-দমন, রাধাকৃষ্ণ, সরস্বতী, কৃষ্ণকালী, বরাহ অবতার, জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা, গণেশ, জগদ্ধাত্রী, গণেশ জননী, যশোদা ইত্যাদি, স্থানীয় দেবদেবীদের মধ্যে স্থান পেয়েছে দক্ষিণ রায়, বনবিবি, নারায়ণী, আটেশ্বর, পঞ্চানন্দ, বড়খাঁ গাজি, বসন্ত রায়, পীর গোরাচাঁদ, ঝোলা বিবি, শীতলা, কালুরায় ও আরও অনেকে। এর পাশাপাশি আছে বেনে, বেনেবউ, বাবু-বিবি, পিওন, মুন্সি, মেম, গোয়ালাবউ, সেপাই, বুড়োবুড়ি, মাতাল, সিংহ, বেড়াল, ঘোড়া, গরু, হাতি, বুলবুলি, টিয়া থেকে কাকাতুয়ার মতো পশুপাখি। এছাড়াও আরো অনেক ধরনের পুতুল।

চিত্র ৩: জয়নগর মজিলপুরেও দেব- দেবীর মাটির মূর্তি

ইনাদের পুতুলের মধ্যে আছে কলকাতার পুরনো বাবু-বিবি সংস্কৃতির মতোই এক সাবেকিয়ানার ছাপ। পুতুলগুলোর গায়ে দেখা যায় নীল, লাল, হলুদ, গাঢ়-সবুজ প্রভৃতি রং-এর গাঢ় প্রলেপ আর কালো রঙের বর্ডার। এগুলো মধ্যে সবথেকে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে শিল্পীদের আঁকা চোখ, যেগুলোর আকৃতির বৈশিষ্ট্যকে বাঁশপাতা বা পটলচেরা চোখ বলা হয়ে থাকে। এই পুতুল লোকসমাজের কাছে অনেক পরিচিতি লাভ করেছে। এছাড়াও এই পুতুলের নানারকম ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহ দেখা যায়, আর এগুলো সম্বন্ধে লিখিত তথ্যও পাওয়া যায়।

চিত্র ৪: জয়নগরের মজিলপুরের দেব দেবীর মূর্তির সাথে বাবু -বিবির মূর্তি

অন্যদিকে শিখরবালির পুতুলও পূর্বপুরুষের বানানো ছাঁচে তৈরি হয়ে থাকে। কিন্তু এদের মধ্যে সাবেকিয়ানার ছাপ নেই। পরিবর্তে এই পুতুলের মধ্যে ফুটে উঠেছে গ্রাম্য সংস্কৃতি ও লৌকিকতা। ইনাদের পুতুলের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে সামাজিক পুতুল যেমন দাদু-দিদা, বর-বউ, ছেলে-মেয়ে, আলহাদি, বউপুতুল ইত্যাদি। এছাড়া আছে হুলোবিড়াল, টিয়া প্রভৃতি পশু-পাখি। পুতুলগুলোর গায়ে লক্ষ্য করা যায় নীল, লাল, হলুদ রং-এর জামাকাপড় ও এর উপর থাকে উজ্জ্বল সোনালী রং এর বর্ডার। আর পুতুলগুলোর চোখ মুখ ফুটিয়ে তোলে কালো রং দিয়ে।এখানকার শিল্পীরা তাদের নিজেদের মনমতো এগুলিকে বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে তোলেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে একটা পুতুল তৈরীরর ক্ষেত্রে ঐতিহ্যকে অনুসরণ করলেও, রঙ করার ক্ষেত্রে শিল্পীরা পরম্পরা মেনে চলেন না। এখানকার পুতুলের মুখমণ্ডলের গঠন ও আকৃতি তুলনামূলকভাবে অস্পষ্ট। বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পটি সাধারণভাবে খুব একটা পরিচিত নাম নয়। এছাড়াও মজিলপুরের পুতুলের এত নিকটবর্তী হওয়া সত্বেও, শিখরবালির মাটির পুতুলের বড়সড় প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যক্তিগত সংগ্রহ গড়ে ওঠে নি। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে, এই পুতুল সম্পর্কে পাওয়া যায় না লিখিত কোনো তথ্য।

উপসংহার

শিখরবালির মাটির পুতুল আমাদের কাছে কয়েক দশক আগের সামাজিক চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছে। এটি কয়েক দশক ধরে চলে আসা একটি ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প যা আমাদের কাছ থেকে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এখানকার বর্তমান শিল্পীদের সাথে আলোচনা করে ও তথ্য সংগ্রহ করে আমি এটুকু বুঝেছি যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকা উপকরণের দাম ও বাজারে উৎপাদিত আকর্ষণীয় খেলনার কারনে মাটির পুতুলের চাহিদা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। এর ফলে শিল্পীদের আর্থিক উপার্জনও কমছে। এসব কারনের জন্য শিল্পীদের চাহিদা ও উৎসাহ ধীরে ধীরে কমছে। নতুন প্রজন্মকে এর সমন্ধে জানানো ও উৎসাহী করার জন্য তাদের মধ্যে ছোট ছোট কর্মশালা করা উচিত। এবং যথেষ্ট পরিমানে পুতুলের সংগ্রহ করা উচিৎ ও তথ্য সংগ্রহ করা উচিৎ বলে আমার বিশ্বাস।

চিত্র ৫: শিখরবালির রাধা কৃষ্ণের মূর্তি

চিএ ৬: শিখরবালির কলসি মাথায় বউ

চিত্র ৭: মেয়ে পুতুল

চিত্র ৮: হুলো বিড়াল

চিত্র ৯: শিখরবালির মাটির পুতুলের একটি ছোট্ট সংমিশ্রণ।

চিত্র ১০: লক্ষী

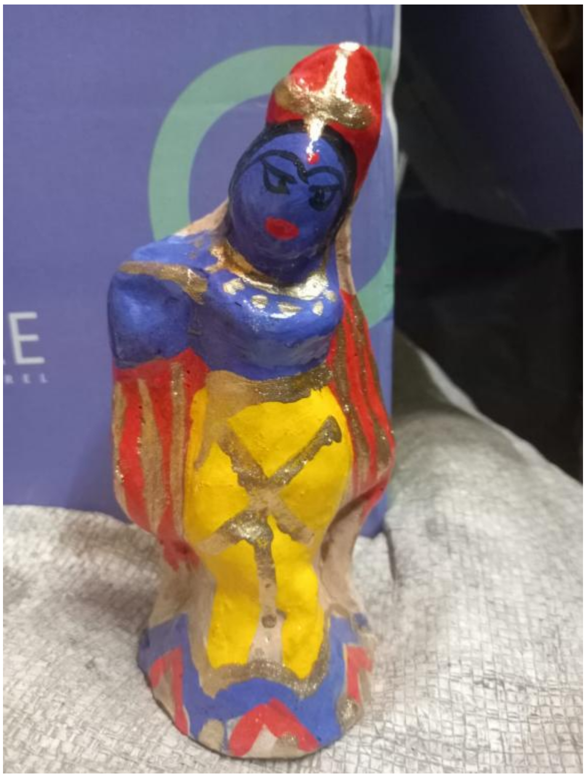

চিএ ১১: কৃষ্ণ

চিত্র ১২: বর বউ

চিত্রসূচী

চিত্র ১: শিখরবালির শীতলা পুজোর মেলাতে, শিখরবালির পুতুলের প্রবীণ বিক্রিতা পুষ্পরাণী পাল

চিত্র ২: শিখরবালির শীতলা পুজোর মেলাতে, শিখরবালির পুতুলের বতর্মান বিক্রিতা পূর্ণিমা পাল

চিত্র ৩: জয়নগর মজিলপুরেও দেব- দেবীর মাটির মূর্তি

চিত্র ৪: জয়নগরের মজিলপুরের দেব দেবীর মূর্তির সাথে বাবু -বিবির মূর্তি

চিত্র ৫: শিখরবালির রাধা কৃষ্ণের মূর্তি

চিত্র ৬: শিখরবালির কলসি মাথার বউ

চিত্র ৭: মেয়ে পুতুল

চিত্র ৮: হুলো বিড়াল

চিত্র ৯: শিখরবালির মাটির পুতুলের একটি ছোট্ট সংমিশ্রণ।

চিত্র ১০: লক্ষী

চিত্র ১১: কৃষ্ণ

চিত্র ১২: বর বউ

চিত্রসূত্র

চিত্র ৩: The Bengal Stores, Handcrafting Stories (Article). *জয়নগর মজিলপুরেও দেব- দেবীর মাটির মূর্তি* (Digital image). Retrieved from https://images.app.goo.gl/Z7TQkYheXL52LpKW7

চিত্র ৪: আনন্দবাজার পত্রিকা (Newspaper). (২০১৪, জানুয়ারি ১২). জয়নগরের মজিলপুরের দেব দেবীর মূর্তির সাথে বাবু -বিবির মূর্তি (Digital image).
https://archives.anandabazar.com/archive/1140112/12special-story.html

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

- সাঁতরা, তারাপদ। ২০১৮। পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পী সমাজ। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারঃ কলকাতা।
- মুখোপাধ্যায়, সোমা। ২০২৩। বাংলার সংস্কৃতিতে পুতুল ও খেলনা। নন্দিতাঃ কলকাতা।
- আমাদের কথা, ২০২৩, ১৫ ফেব্রুয়ারী। নিত্যানন্দপুরের মাটির তৈরি বউ পুতুলI দক্ষিণ ২৪ পরগনার পোড়া মাটির পুতুল। লিঙ্কঃ https://youtu.be/8YSR6-kual0?si=ZQWTKzJmCuxpfG2f

- সাঁতরা, তারাপদ। ২০১৮। পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পী সমাজ। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারঃ কলকাতা।
- মুখোপাধ্যায়, সোমা। ২০২৩। বাংলার সংস্কৃতিতে পুতুল ও খেলনা। নন্দিতাঃ কলকাতা।
- আমাদের কথা, ২০২৩, ১৫ ফেব্রুয়ারী। নিত্যানন্দপুরের মাটির তৈরি বউ পুতুলI দক্ষিণ ২৪ পরগনার পোড়া মাটির পুতুল। লিঙ্কঃ https://youtu.be/8YSR6-kual0?si=ZQWTKzJmCuxpfG2f

- আমাদের কথা,২০২২, ৩১ মার্চ। Shikharbalir putul ২০২২ I শিখরবালির মাটির পুতুল I বাংলার মাটির পুতুল I লিঙ্কঃ https://youtu.be/TYwl_hrb7qk?si=2csGoIZD7tBdv3xJ
- আমাদের কথা, ২০২৪, ১৫ ই জানুয়ারি, তালডাঙ্গা মেলার রানী পুতুল | Rani Putul | Queen Dolls of South 24 Parganas | Matir Rani Putul।লিঙ্কঃ https://youtu.be/wJRFIv7X668?si=7sUkriMnXD1iUky1
- আমাদের কথা, ২০২২, ২ সেপ্টেম্বর, Subhash gramer matir putul I দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুভাষ গ্রামের মাটির পুতুল। লিঙ্কঃ https://youtu.be/gVwnAzabMf0?si=K8JlV1zzm47eR3V5
- E Bangla Vlogs,2022 , ২০মার্চ,জয়নগর মজিলপুরের মাটির পুতুল/ TRADITIONAL CLAY DOLLS OF MAJILPORE/SOUTH 24 PARGANAS CLAY DOLLS. লিঙ্কঃ https://youtu.be/xXyDx1k2v-A?si=6-wKsb5O87qHTPgu
- আমাদের কথা, ২০২১, ১৪ সেপ্টেম্বর, majilpurer matir putul । জয়নগর মজিলপুরের মাটির পুতুল I সুন্দরবনের পুতুল। লিঙ্কঃ https://youtu.be/xrnU6ZSwoEA?si=WggFMTu7WRDTri7-
- আমাদের কথা, ২০২৪ ,৩ জুলাই,বড়িয়ার দিলীপ চিত্রকরের তৈরি মাটির পুতুল | দক্ষিণ ২৪ পরগনার রথের মেলার মাটির পুতুল | রথযাত্রা 2024। লিঙ্কঃ https://youtu.be/dttO-zj5ccc?si=qo9pv6J85CNrg8Lt
- মন্ডল শুভঙ্কর, ২০১৯, ৩১ মার্চ। এই সময়। সংখ্যা ৮৮, বর্ষ ৮, RNI NO. WBBEN/2012/47999

REPORT OF THE PLAGIARISM CHECK

THIS REPORT CERTIFIES THAT THE ATTACHED WORK

শিখরবালির মাটির পুতুল পশ্চিমবঙ্গের এক লোকায়ত শিল্পধারা।

WAS CHECKED WITH THE PLAGIARISM PREVENTION SERVICE

WWW.DUPLICHECKER.COM AND HAS:

EXACT MATCH

1.16%

PARTIAL MATCH

00%

PLAGIARISM

1.16%

FILE NAME:SUKANYA SAHOO_FINE ARTS AND DESIGN_2322220004004.PDF

FILE CHECKED: 17.04.2025

REPORT GENERATED: 17.04.2025

Dupli Checker

Date: 17-04-2025

Plagiarism Scan Report

7% Plagiarism	7% Exact Match	93% Unique	
	0% Partial Match		

Words	385
Characters	2402
Sentences	1
Paragraphs	7
Read Time	2 minute(s)
Speak Time	3 minute(s)

Content Checked For Plagiarism

ভূমিকা

পুতুল সাধারণত বানানো হতো শিশুদের খেলার জন্য। পুতুলগুলি মাটি, কাঠ, গালা, পাতা প্রভৃতি সরঞ্জাম দিয়ে তৈরি করা হতো। এগুলি স্থানীয় বাজার ও মেলা-পার্বণে বিক্রি করা হয়ে থাকে। আমার আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো মাটির পুতুল।

শিল্প-গবেষক দেবদত্ত গুপ্ত তার লেখায় বাংলার পুতুল শিল্পীদের দর্শনটিকে চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন --

"কথা হল পুতুল বানাতে বসে আমাদের পাঁচ ভূতের কারবার করতে হয়। আমাদের পুতুল খেলা ওই পাঁচ ভূতের সাথেই। এমন গ্রামবাংলার শিল্পী কথনে লুকিয়ে আছে এক চমৎকার অর্থ। পাঁচ ভূত বলতে বোঝায় পঞ্চভূতের পাঁচকাহন। শাস্ত্র মতে পঞ্চভুত হল ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। আর ক্ষিতি মানে হল পৃথিবী, অপ কথার মানে হল জল। ঠিক সেইরকম তেজ কথার অর্থ হল আগুন, আর মরুৎ মানে হল বাতাস এবং ব্যোম বলতে বোঝায় শূন্যতা অর্থাৎ আকাশকে। এবার দেখা যাক পুতুল কারিগর এসব দিয়ে কি করেন?

পুতুল কারিগর ক্ষিতি মানে পৃথিবী থেকে মাটি নিয়ে আসে। তারপর অপ অর্থাৎ জল দিয়ে শিল্পী সেই মাটিকে মাখে। সেই নরম মাটিকে সে পরিণত করে মনের মত আকার দেয়। এরপর শিল্পী ভাবেন কাঁচা মাটিতে পুড়িয়ে শক্ত করা কথা। আর তখনই তাঁর দরকার হয় আগুন অর্থাৎ তেজ। এবার তো পুতুলকে ঠান্ডা করতে হবে, তাই সেই পোড়া উত্তপ্ত পুতুল সে দেয় বাতাসের কাছে। সুতরাং তাঁর লাগলো মরুৎ-কে। এবার ব্যোমকে কাজে লাগাতে হবে শিল্পীর। কিন্তু শূন্যতাকে কিভাবে পুতুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে এর উত্তরে লোকশিল্পী বের করে নেয় অবলীলায়। সে সমস্ত পুতুলগুলি বানাতে থাকে ফাঁপা করে। আর ফাঁপা মানেই হল শূন্যতা অথবা অসংখ্য ছিদ্র করা হয় পুতুলের গায়ে। আর সেই শূন্যতাই তখন আকাশ হয়ে নেমে আসে পুতুলের গায়ে। তৈরি হয় মাটির পুতুল। এমনই হল বঙ্গ পুতুলের দর্শন কথা।"

বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক ও মেশিনের তৈরি পুতুলের চাহিদা অনেক বেশি হলেও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় এখনো মাটির পুতুল পাওয়া যায়। যেমন নদীয়ার নবদ্বীপের পুতুল, বর্ধমানের নতুনগ্রাম, কলকাতার কুমোরটুলি ও কালীঘাটের পুতুল, মেদিনীপুরের মাটির পুতুল, পুরুলিয়া জেলার পুতুল, মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরের মাটির পুতুল, মুর্শিদাবাদ জেলার পুতুল, বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়া সোনামুখী ও ঝাড়গ্রাম এর পুতুল, হুগলি পুতুল, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পুতুল ইত্যাদি। আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হলো শিখরবালির মাটির পুতুল -- পশ্চিমবঙ্গের এক লোকায়ত শিল্পধারা।

এর অধ্যায় একে আমি আলোচনা করেছি দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুতুলের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে করেছি শিখরবালির পুতুলের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে কিভাবে একটি কাদামাটির তাল থেকে সম্পূর্ণ পুতুল সৃষ্টি হয় তার বর্ণনা। চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে পুরনো এবং বর্তমান শিল্পীদের শিল্পকৌশল নিয়ে আলোচনা। আর পঞ্চম অধ্যায়ে আছে স্থানীয় মজিলপুরের পুতুলের সাথে শিখরবালির পুতুলের একটি তুলনামূলক আলোচনা।

Matched Source

Similarity 25%

Title:হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার পুতুল ও তার দর্শন কথা /প্রসূন কাঞ্জিলাল

Dec 20, 2021 � ... করেন। পুতুল ... ঠিক সেরকমই তেজ কথার অর্থ হল- আগুন, আর মরুৎ মানে হল- বাতাস। এবং ব্যোম বলতে বোঝায় শূন্যতা অর্থাৎ আকাশকে। এবার দেখা যাক পুতুল কারিগর এসব দিয়ে কি করে?

https://www.jaladarchi.com/2021/12/the-doll-of-bengal-and-its-philosophy-is-getting-lost-prasoon-kanjilal.html

Dupli Checker Date: 17-04-2025

Plagiarism Scan Report

0% Plagiarism	0% Exact Match	100% Unique	
	0% Partial Match		

Words	740
Characters	4832
Sentences	0
Paragraphs	10
Read Time	4 minute(s)
Speak Time	5 minute(s)

Content Checked For Plagiarism

অধ্যায় ১: দক্ষিণবঙ্গের পুতুল -- সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভিন্ন স্থানে এখনও মাটির পুতুল তৈরি হয়। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল -- আখড়াপুঞ্জি ও কঙ্কনবেড়ের পুতুল, পুজালি-ডোঙ্গাড়িয়ার মাটির পুতুল, নিত্যানন্দপুর-এর মাটির বউ পুতুল, মজিলপুরের পুতুল, কামারডাঙ্গর পুতুল,বড়িয়ার পুতুল,সুভাষ গ্রামের পুতুল, ইত্যাদি।

এর মধ্যে আখড়াপুঞ্জি ও কঙ্কণবেড়ের পুতুল পোড়ামাটির তৈরি। তার উপরে রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়। অধিকাংশই ছাঁচে বানানো। পাশাপাশি, হাতে গড়া টেপা পুতুলও তৈরি করা হয়। পুতুলগুলোকে হালকা করার জন্য মাটিকে পাতলা রুটির মতো বেলে নিয়ে তারপর ছাঁচে ফেলা হয়। তারপর পুতুলের অবয়বের সামনের ও পেছনের দুটো খোল জোড়া দিয়ে, এগুলিকে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়। তারপর সেইগুলিকে পুড়িয়ে নিয়ে, শেষে রঙ করা হয়। এখানকার শিল্পিদের রং করার পদ্ধতি বেশ পুরনো । ভুসোকালি, তুঁতে, মেটে সিঁদুর, হরিতাল, এলামাটি, গেড়িমাটি, কাঠখড়ি আর আলতা, এইসব উপকরণ দিয়েই পুতুলের সাজসজ্জা পরিপূর্ণ হতো। যদিও আজকাল অবশ্য রাসায়নিক রঙ-এর ব্যবহার করা হয়। রঙ ভালোভাবে ধরানোর জন্য তেঁতুলবীজের আঠা বা নিমের আঠা প্রভৃতির প্রলেপ দেওয়া হয়। পুতুলগুলির নামও বেশ অদ্‌ভূত, যেমন -- সিলেট পুতুল, হিলিং পুতুল, মুখোশ পুতুল বা বড় পুতুল ও ঝুনঝুনি পুতুল। এছাড়াও কিছু পশু পাখি ও দেব-দেবীর পুতুলও বানিয়ে থাকেন এখানকার শিল্পীরা।[সাঁতরা ২০১৮: ৪৩]

পুজালি-ডোঙ্গাড়িয়ার মাটির পুতুল সাধারণত কুম্ভকার সম্প্রদায়ের লোকেরা বানিয়ে থাকেন। তাই এগুলোকে অনেকে বলেন 'কুমুরে পুতুল,' যার অপভ্রংশ দাঁড়িয়েছে 'কুমিরে পুতুল।' কিন্তু এই সম্প্রদায়ের শিল্পীরা একে বলেন 'রানী পুতুল।' প্রথাগত দু-খোল ছাঁচে তৈরি হয় এই পুতুল। এর পা থাকে না। দেহের দু-পাশে লাগানো দুটি হাত। পরনে ঘাগড়া, মাথায় কোঁকড়ানো চুল। এর 'রানী' নাম সার্থক করার জন্য কোনো কোনো পুতুলের মাথায় থাকে মুকুট, গলায় থাকে ঝোলানো হার। গায়ে অভ্র মেশানো লাল রং দেওয়া হয়। এই রঙের পদ্ধতি বড় বিচিত্র। পনে পুড়িয়ে নেওয়ার পর অভ্র-মিশ্রিত তেঁতুল-বীজের কষের গোলাজলে পুতুলগুলিকে ডুবিয়ে নেওয়া হয়। পরে আবার লাল রঙের জলে ডুবিয়ে নিলে পুতুল হয়ে ওঠে উজ্জ্বল বর্ণময় প্রকৃতির।[সাঁতরা ২০১৮: ৪৮]2

নিত্যানন্দপুর-এর মাটির বউ-পুতুলগুলো হাওড়ার রানী-পুতুলের মত দেখতে হলেও, এর গঠন অনেকটা আলাদা। কিন্তু তুলনামুলকভাবে রোগা ও লম্বাটে এই পুতুলের মুখমন্ডলের আকার বেশ বড় হয়। তবে এখানকার শিল্পীরা এই পুতুলকে 'বউ পুতুল' নামে অভিহিত করেছেন। পুতুলগুলো তৈরি হয় মাঠের এঁটেল মাটি দিয়ে, এবং একে রূপ প্রদান করা হয় ছাঁচের মাধ্যমে। এরপর শিল্পীরা দক্ষ হাতে পুতুলের গায়ে কারুকার্য অঙ্কন করেন, যা পুরোপুরি নিজের মন থেকে বানায়। রঙের জন্য অভ্রকে প্রথমে পোড়ানো হয়, তারপর একটি পাত্রে জলে ভিজিয়ে রাখা হয় । তারপর অভ্র ও জলটিতিক ভালোভাবে মেখে পুতুলগুলিকে রং করা হয়।3

মজিলপুরের পুতুলগুলো ছাঁচে ও হাতে তৈরি করা হয়, এবং এর মাঝের অংশ ফাঁপা থাকে। সাধারণত পুতুলের আলাদা দুটি অংশে তৈরি করে পরে সেগুলোকে জোড়া দিয়ে সম্পূর্ণ করা হয়। এখানে মূলত দুই ধরনের পুতুল তৈরি হয়। প্রথমত,কাঁচা মাটির তৈরি মূর্তি, যা মূলত পূজার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা রোদে শুকানোর পর রঙ করা হয়। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য ধরনের পুতুল, যা শুকানোর পর পুড়িয়ে নিয়ে তারপরে রং করা হয়। এই পুতুলগুলোর গঠন এবং রং (বিশেষত চোখ) খুবই আকর্ষণীয়। শিল্পীরা চোখের আকৃতিকে 'নিমপাতা,' 'বাঁশপাতা' এবং 'পটলচেরা' বলে অভিহিত করেন। রঙের ধরনও কালীঘাটের পটচিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এটি বাবু-বিবি সংস্কৃতির প্রভাবকে প্রতিফলিত করে। এখানকার পুতুলগুলোর মধ্যে আছে আহ্লাদী পুতুল, বাবু পুতুল, বেনেবউ পুতুল এবং বিভিন্ন ধরনের পশুপাখির পুতুল। পাশাপাশি, শিল্পীরা নানা লৌকিক দেবদেবী, আটেশ্বর, বনবিবি, দক্ষিণরায়, রাধাকৃষ্ণ, কালীয়দমন, জগদ্ধাত্রী, গণেশ-জননী, কৃষ্ণ-কালী ইত্যাদি দেবদেবীর পুতুলও তৈরি করেন।4

কামারডাঙ্গর পুতুলগুলি ছাঁচের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এরপর সেগুলো শুকিয়ে পোড়ানো হয়, তারপর রঙ করা হয়। পুতুলগুলিতে অভ্র মিশিত লাল রং করা হয়ে থাকে। পুতুলগুলি দেখতে অনেকটা রানী-পুতুলের মতো হলেও এদের গড়ন তুলনামুলকভাবে পাতলা। এখানকার শিল্পীরা পুতুলগুলিকে 'রানী পুতুল' বা 'বউ পুতুল' নামে উল্লেখ করেন।5

বড়িয়ার শিল্পীরা কাঁচা-মাটির ছাঁচের পুতুল তৈরি করেন, যা রঙ করে তুলির মাধ্যমে তাঁদের সৃজনশীলতা প্রকাশ করেন। এখানে নানান রঙের সুন্দর পুতুল দেখতে পাওয়া যায়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – ছাতা মাথায় পুতুল, সখি পুতুল, বাচ্চা কোলে জননী, কলসি নিয়ে মেয়ে, পুলিশ পুতুল ইত্যাদি। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখি, যেমন– বাঘ, হরিণ এবং পাখির বাসা ইত্যাদি পুতুলও তৈরী করা

Dupli Checker

Date: 17-04-2025

Plagiarism Scan Report

0% Plagiarism	
0% Exact Match	
0% Partial Match	
100% Unique	

Words	472
Characters	3004
Sentences	1
Paragraphs	3
Read Time	3 minute(s)
Speak Time	4 minute(s)

Content Checked For Plagiarism

অধ্যায় ২: পুতুলের সেকাল ও একাল

শিখরবালির মাটির পুতুলগুলো আগে প্রধানত পাল-পাড়ার প্রতিটি বাড়িতে তৈরি হতো। পুতুলগুলো ছিল এদের বংশ-পরম্পরায় ঐতিহ্যবাহী পুতুল। এই পুতুলগুলোর মধ্যে গুরুত্ব পেয়েছে স্থানীয় গ্রাম্য সংস্কৃতি ও লৌকিকতা। পরিবারের পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মহিলারাও এই পুতুল বানিয়ে থাকতেন। এবং পুতুলই ছিল এখানকার পরিবারগুলোর অর্থ উপার্জনের মূল মাধ্যম। অতীতে পুতুলের বিপুল চাহিদা ছিল স্থানীয় মানুষের কাছে ও বিভিন্ন মেলা-পার্বণে। শুধু স্থানীয় এলাকায়ই নয়, শিল্পীরা এই পুতুল নিয়ে পাড়ি দিত দূর-দুরান্তের বিভিন্ন মেলা-পার্বণে। অবশ্য আগে মেলা–পার্বণেরও প্রচলন ছিল অত্যাধিক পরিমাণে। এছাড়াও শিল্পীরা আগে পুতুলগুলো ঝুড়িতে ভরে পাড়ায়-পাড়ায়ও ঘুরে বেড়াতো বিক্রির জন্য।এরা জোরে জোরে বলতেন, পুতুল নেবে গো, পুতুল! এই ধ্বনি শুনে বেরিয়ে আসত পাড়ার ছোট ছোট খুদে বাচ্চারা পুতুল কেনার জন্য। তখন অবশ্য মাটির পুতুলই শিশুদের একমাত্র খেলার মাধ্যম ছিল। এই পুতুল বানানোর জন্য মাটি সহজেই পাওয়া যেত। এবং প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার করত শিল্পীরা। এবং এরা পুতুল বানানোর জন্য ছাঁচের ব্যবহার করত যার ফলে এরা একসাথে অনেক পরিমাণে পুতুল বানাতে পারত। তাই পুতুলগুলোর উৎপাদন করতে খুবই কম খরচ হতো, এর ফলে এটি বিক্রি করে শিল্পীদের লাভ হতো। শিল্পীরা পুতুলগুলি আকৃতি অনুযায়ী এদের দাম নির্ধারণ করতেন। সবথেকে ছোট পুতুলটি মূল্য নির্ধারণ ছিল চারটে একটা টাকা, মাঝারি পুতুলটি ছিল দুটো এক টাকা, এবং তার থেকে বড় পুতুলটি ছিল দু টাকা মূল্যের। বর্তমানে শিখরবালির ঐতিহ্যবাহী মাটির পুতুল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্তির পথে এসে দাঁড়িয়েছে। কারখানায় উৎপাদিত প্লাস্টিকের পুতুলের কারনে অন্যান্য সব পুতুলের মত এই পুতুলের চাহিদাও কমেছে। ফলে বেশিরভাগ পরিবার পুতুল বানানোর কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। এখনমাত্র দুটো পরিবার তাদের বংশ-পরম্পরায় পুতুল বানানোর কাজকে কোনরকমে ধরে রেখেছেন, যদিও এখন পরিবারের পুরুষেরা এই পুতুল বানাতে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন না। তাই বর্তমানে পুতুল তৈরির কাজ পরিবারের মহিলাদের হাত ধরে টিমটিম করে চলছে। তাছাড়াও আজকাল বিভিন্ন এলাকায় আগের মত আর মেলা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হয় না, এর ফলেও পুতুল বিক্রির পরিমাণ কমেছে বেশ কিছুটা। এই পুতুল বানানোর পুরনো শিল্পীরা বয়সের ভারে জরাজীর্ণ তাই তারা আগের মত আর ঝুড়ি সাজিয়ে পাড়ায় পাড়ায় পুতুল বিক্রি করার জন্য ঘুরে বেড়ান না। তাছাড়াও এলাকার বাইরে কোন মেলা পার্বণে অনুষ্ঠানেও তারা আর পুতুল নিয়ে বসেন না। বর্তমানে তাদের পুতুল বিক্রির স্থান হল তাদের বাড়ির কাছে জ্যৈষ্ঠ মাসে অনুষ্ঠিত শীতলাপুজোর মেলা। নতুন প্রজন্ম এই পুতুল বানানো শেখার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয়। তাছাড়াও তারা তাদের পুতুলের গঠন আকৃতি সবকিছুকে আগের মতই ধরে রেখেছেন। তারা বর্তমানের সাথে তাল মিলিয়ে তাদের পুতুলকে পরিবর্তন করতে আগ্রহী নয়। এর ফলেও এদের পুতুলের বিক্রির পরিমাণ বেশ কিছুটা হলেও কমেছে। এবং এদের পূর্বপুরুষদের বানানো মাটির ছাঁচগুলো অনেকগুলোই নষ্ট হয়ে গেছে আর নতুন করে এরা এই ছাঁচ বানাতে পারেনি। এর ফলে এদের পুতুলের সংখ্যা কমেছে , স্বাধীনতা কমেছে উৎপাদনও ।তাছাড়া শিল্পীরা পুতুলের দাম সামান্য বৃদ্ধি করে ছোট পুতুলের দাম ৫ টাকা, মাঝারি পুতুলের দাম ১০ টাকা, আর বড় পুতুলের দাম ১৫ টাকাই রেখেছেন। কিন্তু বর্তমানে এই পুতুলগুলো বানানোর জন্য মাটি থেকে শুরু করে রঙ্ পর্যন্ত সবকিছু বাজার থেকে বেশি মূল্য ব্যয় করে শিল্পীদের ক্রয় করতে হয়। তাই এর উৎপাদন খরচ অনেক বেশি পড়ে যায়। ফলে পুতুলগুলো বিক্রি করে যথেষ্ট পরিমাণে মুনাফা হচ্ছে না।

Matched Source

No plagiarism found

Dupli Checker

Date: 17-04-2025

Plagiarism Scan Report

0% Plagiarism

0% Exact Match

0% Partial Match

100% Unique

Words	474
Characters	2916
Sentences	0
Paragraphs	6
Read Time	3 minute(s)
Speak Time	4 minute(s)

Content Checked For Plagiarism

অধ্যায় ৩: পুতুল তৈরির মাধ্যম ও প্রক্রিয়া

শিখরবালির মাটির পুতুল তৈরি হয় এখানকার বংশপরম্পরা মেনে পুরনো পদ্ধতিতে। আগে যদিও এই কাজে স্থানীয় এঁটেল মাটি ব্যবহার করা হতো, কিন্তু বর্তমানে মাটি কিনে পুতুল তৈরি করা হয়।

মাটিটাকে কিনে নিয়ে আসার পর অল্প পরিমাণে জল দিয়ে ভিজিয়ে কিছুদিন ভালো করে প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। তারপর এটিকে ভালোভাবে মাখাতে হয় এবং মাখার সময় এর মধ্যে থাকা ছোট-বড় পাথরের টুকরোগুলোকে বের করে দেওয়া হয় যাতে পতুল তৈরির মাটিটি একবারে মসৃণ হয়। মাটিটি যখন পুতুল তৈরির জন্য উপযুক্ত অবস্থায় আসে তখন এগুলিকে শিল্পীরা তাদের কাছে থাকা বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ছাঁচে দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে।

প্রথমে ছাঁচগুলোকে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হয়। তারপর এর ভেতরের অংশে ভালোভাবে চক-পাউডার লাগানো হয়। যাতে মাটিটি দেওয়ার পর ছাঁচের গায়ে না লেগে যায় এবং পুতুলটি অক্ষত অবস্থায় ছাঁচ থেকে বেরিয়ে আসে। ছাঁচের দুটি অংশে আলাদা করে শিল্পীরা নিজেদের হাত দিয়ে চেপে চেপে এর মধ্যে মাটি ভরেন। কিন্তু ছাঁচ গুলোতে পুরোপুরি মাটি দিয়ে ভরাট করেন না যাতে এই দুটিকে পরে জোড়ার সময় এই দুটির মাঝখানের অংশ ফাঁপা থাকে। তারপর মাটিটি পুরোপুরি শুকানোর আগে ছাঁচের দুটি অংশ ভালোভাবে জোড়া হয়। তারপর ছাঁচ থেকে বের করে পুতুলগুলোকে রোদে শুকাতে দেওয়া হয়। এগুলো ভালোভাবে শুকানোর জন্য প্রায় পাঁচ থেকে ছয় দিন সময় লেগে যায়, তারপর প্রস্তুতি নেওয়া হয় পোড়ানোর জন্য। পোড়ানোর জন্য এগুলিকে পোনে (পোড়ানোর চুল্লি) দেওয়া হয়। দেওয়ার পর প্রথম এক ঘন্টা এগুলিকে খুব অল্প তাপমাত্রায় গরম করা হয় তারপর ধীরে ধীরে এর তাপমাত্রা বাড়ানো হয়। তারপর দু'ঘণ্টা উচ্চ তাপমাত্রায় পোড়ানো হয়। এরপর এগুলোকে ঠান্ডা হওয়ার জন্য রেখে দেওয়া হয় একদিনের জন্য। পরের দিন এগুলোকে বের করে ভালোভাবে পরিষ্কার করা হয়। তারপর এগুলোকে রং করার পালা।

পোড়ানোর পর পুতুলগুলোতে খড়িমাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। খড়িমাটিকে জলের সাথে ভিজিয়ে রাখা হয় একদিনের জন্য। তারপর তাকে জলের সাথে মিশিয়ে একটি গাঢ় মিশ্রণ তৈরী করা হয়, এরপর এটি ব্যবহারের যোগ্য হয়ে ওঠে। পোড়ানো পুতুলগুলির গায়ে খড়িমাটির প্রলেপ দিয়ে এগুলিকে শোকানোর জন্য এক দুদিন রেখে দেওয়া হয়। শুকানোর পর শিল্পীরা তাদের নিজেদের মনমতো এগুলিকে বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে তোলেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে একটা পুতুল তৈরীরর ক্ষেত্রে ঐতিহ্যকে অনুসরণ করলেও, রঙ করার ক্ষেত্রে শিল্পীরা পরম্পরা মেনে চলেন না। বাংলা তথা ভারতবর্ষের লোকায়ত শিল্পধারার এ এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

শিখরবালির পুতুলের রংটিও শিল্পীরা একটি বিশেষ পদ্ধতিতে বানিয়ে থাকেন। রং হিসাবে ওনারা বাজার থেকে কিনে আনা গুঁড়ো রং ব্যবহার করেন এবং সেই রঙের সাথে তেঁতুল বীজের আঠা মিশিয়ে থাকেন। এই আঠাটিও ওনারা বাজার থেকে গুঁড়ো কিনে নিয়ে আসেন। তারপর দুটোকে পরিমাণ মতো দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পর এটিকে পুতুলের গায়ে ব্যবহার করেন তুলির ছোঁয়ায়। এই রঙের উপর থেকে সোনালী রঙের বর্ডার দেন এবং মুখমন্ডলের ওপর কালো রঙ দিয়ে চোখ এবং মুখের আকার ফুটিয়ে তোলেন। শুকিয়ে গেলে একটা বড় পাত্রে আগে থেকে ভিজিয়ে রাখা সাবু ও জলের মিশ্রণের মধ্যে পুতুলগুলোকে ভালোভাবে ডুবিয়ে নেওয়া হয়। এরপর এগুলোকে শুকনো করার জন্য রেখে দেওয়া হয় এক থেকে দুই দিনের জন্য। অবশেষে পুতুলগুলোর গায়ের রং উজ্জ্বল করার জন্য শিল্পীরা ব্যবহার করেন বার্নিশ। এইভাবেই শিল্পীর হাতে এক একটি পুতুল গড়ে ওঠে।

Matched Source

No plagiarism found

Dupli Checker

Date: 17-04-2025

Plagiarism Scan Report

0% Plagiarism	0% Exact Match	100% Unique	Words 410
			Characters 2569
			Sentences 0
	0% Partial Match		Paragraphs 7
			Read Time 3 minute(s)
			Speak Time 3 minute(s)

Content Checked For Plagiarism

অধ্যায় ৪: শিখরবালির পুতুল শিল্পীর অতীত ও বর্তমান
বারুইপুর থানার অন্তর্গত শিখরবালির মধ্যে একটি ছোট্ট পাড়া হলো পালপাড়া। এক সময় এই পালপাড়ার প্রতিটি ঘরে প্রতিটি মানুষ এই মাটির পুতুল তৈরি করত। অতীতে এই পাড়ার মাটির পুতুলই এখানকার সামাজিক জীবনযাপনকে উপস্থাপনা করতো এবং পুতুলগুলি তখন শিল্পীদের একমাত্র অর্থ ও সম্মানের মূল উৎস ছিল। এবং শিল্পীদের কাছে মূল পেশাই ছিল পুতুল নির্মাণ করা। পুতুল বিক্রি করে তাদের যা অর্থ উপার্জন হতো তার এই দিয়েই তাদের জীবন যাপন অতিবাহিত হয়ে যেত। আগে পরিবারের ছেলে মেয়ে উভয়ই সমানভাবে এই কাজ করে থাকতো। অতীতে অনেক শিল্পীরাই এই পেশার সাথে যুক্ত ছিল, যদিও তাদের নাম যথাযথভাবে কখনো কোথাও লিপিবদ্ধ করা হয় নি। কিছু শিল্পী আছে যাদের নাম আমরা পেয়েছি তাদের পারিবারিক সূত্রে। তার মধ্যে সবথেকে প্রবীণ হল সীতানাথ পাল এবং উনার স্ত্রী।

চিত্র ১: শিখরবালির শীতলা পুজোর মেলাতে, শিখরবালির পুতুলের প্রবীণ বিক্রিতা পুষ্পরাণী পাল
তারপর কালের নিয়মে পুতুলের চাহিদা কমতে থাকে বাজারের শস্তা টেঁকসই বিকল্প মাধ্যমে তৈরী তুলণামূলকভাবে আকর্ষণীয় পুতুলের কারণে। এই জন্য এখানকার সমস্ত পরিবারে তাদের পুতুল বানানোর কাজ ছেড়ে দিয়ে অর্থ উপার্জনের জন্য বিভিন্ন পেশা যোগদান করেন। অবশেষে থেকে যায় এখানকার দুটি পরিবার, যারা কালের নিয়মকে অগ্রাহ্য করে তাদের বংশ-পরম্পরার ঐতিহ্যকে কোনরকমে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন প্রয়াত কেনারাম পাল ও উনার স্ত্রী পুষ্পরাণী পাল। পাশাপাশি ছিলেন প্রয়াত ভৈরব পাল ও উনার স্ত্রী ভারতী পাল। যদিও এই সময় পরিবারের পুরুষেরা পুতুল বানানোর সাথে সাথে জীবিকা নির্বাহ ও অর্থ উপার্জনের জন্য অন্য কাজও করে থাকতেন। ইনাদের মধ্যে পুষ্পরাণী পাল এবং ভারতী পাল বর্তমানে জীবিত আছেন।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাজারে পাওয়া উপকরণের দাম বাড়তে থাকায় এবং এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বহুবছর ধরে চলে আসা মেলা-পার্বণগুলো ধীরে ধীরে বন্ধ হওয়ার কারণে পুতুল বিক্রির পরিমাণ ক্রমাগত কমে আসে। তাই বর্তমানে পুষ্পরাণী পালের বাড়িতে উনার পুত্র ও পুত্রবধূরা বা বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা কেউ আর এই পুতুল বানানোর কাজ করেন না। এমন কি বতর্মান প্রজন্ম এই কাজ শেখার জন্যেও বিন্দুমাত্র উৎসাহী নয়। এর ফলে এই পরিবারও সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

চিত্র ২: শিখরবালির শীতলা পুজোর মেলাতে, শিখরবালির পুতুলের বতর্মান বিক্রিতা পূর্ণিমা পাল
এরপর আছেন ভারতী পালের পরিবার। এই পরিবারে এনার ছেলে পুতুল বানানোর কাজ করেন না, বর্তমানে তিনি অর্থ উপার্জনের জন্য জামাকাপড়ের ব্যবসা করে থাকেন। কিন্তু উনার পুত্রবধূ পূর্ণিমা পাল এখনো পুতুল বানানোর কাজটি চালিয়ে যাচ্ছেন। ইনি এখানকার পুরো পালপাড়ার ঐতিহ্যবাহী বংশ পরম্পরা ছাঁচের মাটির পুতুলের শেষ অবলম্বন হিসাবে দাঁড়িয়ে আছেন। কারণ এই পরিবারের নতুন প্রজন্ম এই পুতুল বানানো শেখার জন্য বিন্দুমাত্র উৎসাহিত নয়। ইনার পরে হয়তো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্য থেকে বাংলার আরও একটি ঐতিহ্যবাহী পুতুল হারিয়ে যাবে। হারিয়ে যাবে লোকশিল্পের এই শিল্পীরাও।

Matched Source

No plagiarism found

Dupli Checker

Date: 17-04-2025

Plagiarism Scan Report

0% Plagiarism	0% Exact Match	100% Unique	Words 559
	0% Partial Match		Characters 3669
			Sentences 0
			Paragraphs 9
			Read Time 3 minute(s)
			Speak Time 4 minute(s)

Content Checked For Plagiarism

অধ্যায় ৫: জয়নগরের মাটির পুতুলের সঙ্গে তুলনা মূলক আলোচনা
দক্ষিণ ২৪ পরগনার শিখরবালির পাশাপাশি ঐ একই জেলার জয়নগরের মজিলপুরেও আছে মাটির পুতুল তৈরীর আরেকটি পারম্পরিক ঐতিহ্য। এই দুই জায়গা কাছাকাছি অঞ্চলের হলেও তাদের পুতুলগুলোর গঠনবৈচিত্র্য, রঙের ব্যবহার সবকিছুই অনেক বিপরীত ধর্মী একে অপরের থেকে।
মজিলপুরের এই পুতুল প্রথমে শুরু হয়েছিল টেপা পুতুল দিয়ে। পরবর্তীকালে এরা ছাঁচ বানিয়ে বংশপরম্পরায় এই পুতুল বানিয়ে থাকেন। এদের কথা থেকে জানা যায় যে এরা প্রায় আড়াইশো বছর ধরে এই পুতুল বানিয়ে চলেছেন এখানকার শিল্পীরা। বর্তমানে এদের অষ্টম প্রজন্ম শম্ভু দাস এই পুতুল বানিয়ে থাকেন। এনারা প্রায় একশকুড়ি রকমের পুতুল বানিয়ে থাকেন। কিন্তু এদের সমস্ত ছাঁচ বংশ পরম্পরায় বানানো নয়, কিছু কিছু ছাঁচ শিল্পী বিশেষ তার সময়কালে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নিজের হাতে বানিয়েছেন। ইনাদের এই পুতুলের মধ্যে সবথেকে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে দেব-দেবীর মূর্তি, যেমন -- শীতলা, লক্ষীনারায়ণ, দুর্গা, শিব-সতী, কালী, নারায়ণ, মাতাল শিব, নন্দী-ভৃঙ্গী, কালীয়-দমন, রাধাকৃষ্ণ, সরস্বতী, কৃষ্ণকালী, বরাহ অবতার, জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা, গণেশ, জগদ্ধাত্রী, গণেশ জননী, যশোদা ইত্যাদি, স্থানীয় দেবদেবীদের মধ্যে স্থান পেয়েছে দক্ষিণ রায়, বনবিবি, নারায়ণী, আটেশ্বর, পঞ্চানন্দ, বড়খাঁ গাজি, বসন্ত রায়, পীর গোরাচাঁদ, ঝোলা বিবি, শীতলা, কালুরায় ও আরও অনেকে। এর পাশাপাশি আছে বেনে, বেনেবউ, বাবু-বিবি, পিওন, মুন্সি, মেম, গোয়ালাবউ, সেপাই, বুড়োবুড়ি, মাতাল, সিংহ, বেড়াল, ঘোড়া, গরু, হাতি, বুলবুলি, টিয়া থেকে কাকাতুয়ার মতো পশুপাখি। এছাড়াও আরো অনেক ধরনের পুতুল।

চিত্র ৩: জয়নগর মজিলপুরেও দেব- দেবীর মাটির মূর্তি

ইনাদের পুতুলের মধ্যে আছে কলকাতার পুরনো বাবু-বিবি সংস্কৃতির মতোই এক সাবেকিয়ানার ছাপ। পুতুলগুলোর গায়ে দেখা যায় নীল, লাল, হলুদ, গাঢ়-সবুজ প্রভৃতি রং-এর গাঢ় প্রলেপ আর কালো রঙের বর্ডার। এগুলো মধ্যে সবথেকে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে শিল্পীদের আঁকা চোখ, যেগুলোর আকৃতির বৈশিষ্ট্যকে বাঁশপাতা বা পটলচেরা চোখ বলা হয়ে থাকে। এই পুতুল লোকসমাজের কাছে অনেক পরিচিতি লাভ করেছে। এছাড়াও এই পুতুলের নানারকম ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহ দেখা যায়, আর এগুলো সম্বন্ধে লিখিত তথ্যও পাওয়া যায়।

চিত্র ৪: জয়নগরের মজিলপুরের দেব দেবীর মূর্তির সাথে বাবু -বিবির মূর্তি
অন্যদিকে শিখরবালির পুতুলও পূর্বপুরুষের বানানো ছাঁচে তৈরি হয়ে থাকে। কিন্তু এদের মধ্যে সাবেকিয়ানার ছাপ নেই। পরিবর্তে এই পুতুলের মধ্যে ফুটে উঠেছে গ্রাম্য সংস্কৃতি ও লৌকিকতা। ইনাদের পুতুলের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে সামাজিক পুতুল যেমন দাদু-দিদা, বর-বউ, ছেলে-মেয়ে, আলহাদি, বউপুতুল ইত্যাদি। এছাড়া আছে হুলোবিড়াল, টিয়া প্রভৃতি পশু-পাখি। পুতুলগুলোর গায়ে লক্ষ্য করা যায় নীল, লাল, হলুদ রং-এর জামাকাপড় ও এর উপর থাকে উজ্জ্বল সোনালী রং এর বর্ডার। আর পুতুলগুলোর চোখ মুখ ফুটিয়ে তোলে কালো রং দিয়ে।এখানকার শিল্পীরা তাদের নিজেদের মনমতো এগুলিকে বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে তোলেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে একটা পুতুল তৈরীরর ক্ষেত্রে ঐতিহ্যকে অনুসরণ করলেও, রঙ করার ক্ষেত্রে শিল্পীরা পরম্পরা মেনে চলেন না। এখানকার পুতুলের মুখমণ্ডলের গঠন ও আকৃতি তুলনামূলকভাবে অস্পষ্ট। বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পটি সাধারণভাবে খুব একটা পরিচিত নাম নয়। এছাড়াও মজিলপুরের পুতুলের এত নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও, শিখরবালির মাটির পুতুলের বড়সড় প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যক্তিগত সংগ্রহ গড়ে ওঠে নি। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে, এই পুতুল সম্পর্কে পাওয়া যায় না লিখিত কোনো তথ্য।

উপসংহার
শিখরবালির মাটির পুতুল আমাদের কাছে কয়েক দশক আগের সামাজিক চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছে। এটি কয়েক দশক ধরে চলে আসা